বঙ্গদেশের চৈতন্য অনুসারী বৈষ্ণব সম্প্রদায়: সামাজিক সচলতা ও বর্ণজাতি কাঠামো

(খ্রি. ষোড়শ - খ্রি. অষ্টাদশ শতাব্দী)

গবেষণা অভিসন্দর্ভের সংক্ষিপ্তসার

গবেষক- অভিজিত সাধুখাঁ

রেজিস্ট্রেশন নং- AOOCL1100217

রেজিস্ট্রেশনের তারিখ- ২৭/১১/২০১৭

তত্ত্বাবধায়ক- ড. ঈপ্সিতা হালদার, সহযোগী অধ্যাপক

তুলনামূলক সাহিত্য বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

তুলনামূলক সাহিত্য বিভাগ

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

কলকাতা-৭০০০৩২

২০২১

অধ্যায় পরিকল্পনা

প্রাক্কথন

ভূমিকা

প্রথম অধ্যায়	সামাজিক সচলতা ও বর্ণজাতিকাঠামো: পাঠপদ্ধতি বিষয়ক আলোচনা
দ্বিতীয় অধ্যায়	বর্ণজাতিকাঠামোয় সামাজিক সচলতা: স্থান, কাল, পাত্র
তৃতীয় অধ্যায়	বঙ্গদেশের চৈতন্য অনুসারী বৈষ্ণব সম্প্রদায় এবং বর্ণজাতিকাঠামোয় সামাজিক সচলতা: সুবর্ণবণিক
চতুর্থ অধ্যায়	বঙ্গদেশের চৈতন্য অনুসারী বৈষ্ণব সম্প্রদায় এবং বর্ণজাতিকাঠামোয় সামাজিক সচলতা: মল্লরাজবংশ
পঞ্চম অধ্যায়	বঙ্গদেশের চৈতন্য অনুসারী বৈষ্ণব সম্প্রদায় এবং বর্ণজাতিকাঠামোয় সামাজিক সচলতা: সদ্‌গোপ

সিদ্ধান্ত

সংক্ষিপ্তসার

ভূমিকা::

ভারতবর্ষে বর্ণ-জাতিকাঠামোর স্থবির চরিত্র সম্পর্কে ঔপনিবেশিক প্রশাসকরা মোটের উপর নিশ্চিত ছিলেন। তাঁরা ভারতবর্ষকে বুঝতে চেয়েছিলেন ধর্মশাস্ত্রের প্রমাণের ভিত্তিতে। ধর্মশাস্ত্রগুলির পর্যালোচনা করলে আপাতভাবে একপ্রকার 'স্থাণু' কাঠামোর কথা চোখে পড়ে বটে। অবশ্য ধর্মশাস্ত্রগুলিও বিভিন্ন সময়ে, বিভিন্ন অঞ্চলে লেখা হয়েছে; বিভিন্ন ধর্মশাস্ত্রের ভাষ্যও লেখা হয়েছে আলাদা আলাদা সময়ে। সেই সূত্রগুলি খুঁটিয়ে পড়লে আপাত 'স্থাণু' কাঠামোর ভিতরেও নানাবিধ পরিবর্তন, সচলতা চোখে পড়ে। ঔপনিবেশিক প্রশাসকদের অনেকেই অবশ্য সেসব খুব খুঁটিয়ে পড়েননি। অনেক পরবর্তীকালে, মূলত বিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে ঐতিহাসিক, সমাজতাত্ত্বিক, নৃতাত্ত্বিকদের গবেষণায় বর্ণজাতিকাঠামোয় সামাজিক সচলতার অনুসন্ধান গুরুত্ব পায়। সেই সূত্র ধরে ১৯৮১ খ্রিস্টাব্দে হিতেশরঞ্জন সান্যাল *Social Mobility in Bengal* নামে একটি প্রণিধানযোগ্য গবেষণাগ্রন্থ প্রকাশ করেন। প্রাক্-ঔপনিবেশিক বঙ্গদেশে সামাজিক সচলতার কারণ, মাধ্যম এবং অভিব্যক্তিগুলি উঠে এসেছিল হিতেশরঞ্জন সান্যালের গবেষণায়। বর্তমান গবেষণারও আলোচ্য বঙ্গদেশের খ্রি. ষোড়শ- খ্রি. অষ্টাদশ শতাব্দীর সামাজিক সচলতা। ইতিপূর্বে খ্রিস্টীয় দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতাব্দীতে রচিত *বৃহদ্ধর্মপুরাণ* ও *ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ*-এ বঙ্গদেশের দুটি বর্ণজাতিকাঠামোর উল্লেখ পাওয়া যায়। বঙ্গদেশে চতুর্বর্ণের ভারতীয় কাঠামোটি দেখা যায় না; এখানে দুটিই বর্ণ—ব্রাহ্মণ ও শূদ্র। শূদ্র বর্ণের মধ্যেও উত্তম সংকর, মধ্যম সংকর, অধম সংকর বা সৎশূদ্র-অসৎশূদ্র বিভাগ রয়েছে। মধ্যম বা অধম সংকর বা অসৎশূদ্ররা ধর্মকৃত্যগত মর্যাদার বিচারে অনেকটাই নিম্নসারিভুক্ত। আমাদের গবেষণা এমনই তিনটি ধর্মকৃত্যগত মর্যাদাহীন জাতিকেন্দ্রিক—সুবর্ণবণিক, বিষ্ণুপুরের মল্লরাজবংশ (আদতে বাগদি), সদ্গোপ। এই তিনটি গোষ্ঠীই অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক প্রতিপত্তি অর্জন করে খ্রিস্টীয় ষোড়শ-অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যে। কিন্তু,

অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক প্রতিপত্তির সঙ্গে ধর্মকৃত্যগত মর্যাদার সংগতি ছিল না। অথচ প্রাক্-ঔপনিবেশিক ভারতবর্ষে বর্ণজাতিকেন্দ্রিক সমাজে ধর্মকৃত্যগত মর্যাদা ছাড়া সামাজিক-রাজনৈতিক-নৈতিক কর্তৃত্ব বজায় রাখা কার্যত অসম্ভব। এই তিনটি গোষ্ঠী সামাজিক সচলতার রাস্তা খুঁজে নেয় বঙ্গদেশের চৈতন্য অনুসারী বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মাধ্যমে। সুবর্ণবণিকরা শরণাপন্ন হন নিত্যানন্দ গোষ্ঠীর, বিষ্ণুপুরের মল্ল রাজবংশকে দীক্ষা দেন বৃন্দাবন ফেরত শ্রীনিবাস আচার্য, সদ্‌গোপ সমাজের সঙ্গে যোগ থাকে বৃন্দাবন ফেরত আরেক বৈষ্ণবগুরু শ্যামানন্দের। এই বৈষ্ণব পরম্পরার সূত্রে উপরিউক্ত গোষ্ঠীগুলি সৎ ব্রাহ্মণের পৌরোহিত্য পেতে থাকে, সাধনাধিকার বৃদ্ধি পায়। আমাদের আলোচ্য তিনটি গোষ্ঠী প্রাক্-ঔপনিবেশিক বঙ্গদেশের আঞ্চলিক শ্রেণিবিভাগ অনুযায়ী রাঢ় অঞ্চলের সঙ্গে যুক্ত। এই সামাজিক সচলতার প্রকৃতিটি আঞ্চলিক। প্রথমত, অঞ্চলগত অর্থনৈতিক সম্ভাবনাকে কাজে লাগিয়েই গোষ্ঠীগুলির উত্থান। দ্বিতীয়ত, একটি অঞ্চলে গোষ্ঠীর মর্যাদাবৃদ্ধি অপর অঞ্চলে সংশ্লিষ্ট গোষ্ঠীর মর্যাদাবৃদ্ধি করে না। বিভিন্ন অঞ্চলে অবস্থানকারী একই গোষ্ঠীর সামগ্রিক এবং ঐক্যবদ্ধভাবে মর্যাদাবৃদ্ধির প্রয়াস শুরু হয় আরও পরে; ঔপনিবেশিক পর্বে। রাঢ়ের এই তিনটি গোষ্ঠীর সামাজিক সচলতার সূত্রে খ্রিস্টীয় ষোড়শ-অষ্টাদশ শতাব্দীর বঙ্গদেশের বর্ণজাতিকাঠামোর চরিত্র এবং একইসঙ্গে বৈষ্ণবধর্মের ধর্মদর্শনগত এবং সাংগঠনিক চরিত্রও বোঝা সম্ভব। সেই কাজটিই আমরা করতে চেয়েছি প্রাসঙ্গিক সাহিত্য, পুরালেখ, বিদেশি পর্যটকের ভ্রমণবৃত্তান্ত, প্রশাসনিক নথি ইত্যাদির উপর ভিত্তি করে।

গবেষণা প্রশ্ন::

১. অঞ্চলগত অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক সম্ভাবনাকে কাজে লাগিয়ে কীভাবে একটি গোষ্ঠী সামাজিক সচলতা লাভ করতে পারে? পরিবর্তনের কারণ, তীব্রতা এবং অভিব্যক্তি কেন সামাজিক সচলতার প্রক্রিয়া নিরূপণে জরুরি?

২. খ্রিস্টীয় ষোড়শ- খ্রিস্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীতে বঙ্গদেশের বর্ণজাতিকাঠামোয় কেন এবং কী ধরনের পরিবর্তন হচ্ছে?

৩. বঙ্গদেশের চৈতন্য অনুসারী বৈষ্ণব সম্প্রদায় কেন এবং কীভাবে সামাজিক সচলতায় গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে?

৪. বঙ্গদেশে নির্দিষ্ট সময়পর্বে নির্দিষ্ট গোষ্ঠীগুলির কাছে সামাজিক মর্যাদাবৃদ্ধির জন্য ইসলাম ধর্মগ্রহণের পরিবর্তে নির্দিষ্ট বর্ণজাতিকাঠামোর মধ্যে মর্যাদাবৃদ্ধি ও উত্থানের প্রয়াস আকর্ষণীয় হল কেন?

৫. বৈষ্ণবধর্মের প্রাতিষ্ঠানিক সংগঠনের সঙ্গে সামাজিক সচলতার প্রক্রিয়ার যোগ কীভাবে ঘটছে?

গবেষণার উদ্দেশ্য::

১. খ্রিস্টীয় ষোড়শ-খ্রিস্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীতে সুবর্ণবণিক, মল্লরাজবংশ ও সদ্‌গোপদের সামাজিক সচলতার সূত্রে বঙ্গদেশের বর্ণজাতিকাঠামোয় পরিবর্তনকে চিহ্নিত করা।

২. বঙ্গদেশের সামাজিক সচলতা ও বর্ণজাতিকাঠামোর ক্ষেত্রে চৈতন্য অনুসারী বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের ভূমিকা অনুসন্ধান।

৩. ধর্মান্তরণের মাধ্যমে সামাজিক মানোন্নয়নের বদলে নির্দিষ্ট বর্ণজাতিকাঠামোর মধ্যে সচলতাপ্রাপ্তির প্রয়াসের কারণ বিশ্লেষণ।

৪. বিভিন্ন গোষ্ঠীর কাছে বৈষ্ণবধর্মের ভিন্ন ভিন্ন তাৎপর্য ও বৈষ্ণবধর্মের সাংগঠনিক প্রেক্ষিত এবং সামাজিক সচলতার সম্পর্ক বিচার।

গবেষণা পদ্ধতি:

প্রথমত, অনুশাসনমূলক বা নির্দেশমূলক গ্রন্থ(normative text) ব্রাহ্মণ্য মতাদর্শ চালিত। স্মৃতিশাস্ত্র বা ধর্মশাস্ত্র ইত্যাদির সঙ্গে সামাজিক বাস্তবতার যোগ একটু দূরের। স্মৃতিশাস্ত্র বা ধর্মশাস্ত্রের বিধানে সমাজের একটি গোষ্ঠীর দৃষ্টিকোণ থেকে আদর্শ সমাজের একটি কল্পনা হাজির করা হয়ে থাকে। 'আদর্শ' সমাজের ধারণা আর সমাজের বাস্তব চিত্রের দূরত্ব অনেকখানি। কাজেই, সামাজিক সচলতার আলোচনায় অনুশাসনমূলক গ্রন্থের বাইরে অন্যান্য পুরালেখ, ভ্রমণবৃত্তান্ত, ইতিবৃত্ত, সাহিত্যিক সূত্র ইত্যাদি বিবরণাত্মক গ্রন্থ বা রচনা(descriptive text)- উপর জোর দেওয়া হয়েছে।

দ্বিতীয়ত, সামাজিক সচলতা প্রাপ্তি(ঊর্ধমুখী বা অধোমুখী) একটি দীর্ঘমেয়াদি প্রক্রিয়ার ফল। ফলে জাতপাত এবং সামাজিক সচলতার ইতিহাস অনুসন্ধানে বিভিন্ন তথ্যসূত্রের দ্বিকালিক বা কালানুক্রমিক পাঠ (diachronic study)—এই গবেষণার আরেকটি পদ্ধতিগত দিক।

তৃতীয়ত, সামাজিক সচলতার সঙ্গে অবশ্যম্ভাবীভাবে সামাজিক পরিবর্তনের ধারণাটি যুক্ত। এই পরিবর্তনের মূলত তিনটি অভিমুখ আছে বলে আমাদের মনে হয়—পরিবর্তনের কারণ, পরিবর্তনের অভিব্যক্তি, পরিবর্তনের তীব্রতা। পদ্ধতিগতভাবে গবেষণায় এই দিকটিতে নজর থাকবে।

চতুর্থত, বর্ণজাতিকাঠামোর সর্বভারতীয় রূপটির তুলনায় আঞ্চলিক রূপ বা বৈচিত্রগুলিই আমাদের মনোযোগের কেন্দ্রে থাকবে।

পঞ্চমত, ভারতীয় সমাজব্যবস্থায় সচলতা যেহেতু কেবল আর্থিক পুঁজি নির্ভর নয়, বরং, ধর্মীয় অনুমোদনও একইসঙ্গে জরুরি; সুতরাং সামাজিক সচলতার আলোচনায় ধর্মসম্প্রদায়ের ভূমিকা এপ্রসঙ্গে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

ষষ্ঠত, বৈষ্ণবীয় চরিত বা কড়চার সম্প্রদায়ভিত্তিক অভিমুখ, সম্প্রদায়বিশেষের ধর্মদর্শনের সঙ্গে জাতপাতের সম্পর্ক, চরিতগ্রন্থ বা অন্যান্য সাহিত্যের প্রামাণিকতা বা নির্ভরযোগ্যতা বিষয়ক তর্ক এই আলোচনায় অনিবার্য।

অধ্যায় সারসংক্ষেপ::

১. সামাজিক সচলতা ও বর্ণজাতিকাঠামো: পাঠপদ্ধতি বিষয়ক আলোচনা—

এই অধ্যায়ে ঔপনিবেশিক পর্ব থেকে শুরু করে স্বাধীনোত্তর ভারতবর্ষে বর্ণজাতিকাঠামো চর্চার বিভিন্ন পদ্ধতিগত দিক আলোচিত। ঔপনিবেশিক প্রশাসকদের বর্ণজাতিকাঠামোর আলোচনায় অনুশাসনাত্মক গ্রন্থের দিকে ঝোঁক, লুই দুমোঁর বর্ণজাতিকাঠামো সংক্রান্ত তাত্ত্বিক বয়ান আমরা এই অধ্যায়ে আলোচনা করেছি। দুমোঁর যে সমালোচনা পরবর্তী তাত্ত্বিকরা করেছেন তার মধ্যেও গুরুত্বপূর্ণ পাঠপদ্ধতির ইঙ্গিত ছিল। অনুশাসনাত্মক গ্রন্থের বাইরে গিয়ে সমাজতাত্ত্বিক বা নৃতাত্ত্বিকদের আলোচনার ধারার মধ্যে গুরুত্বসহকারে আলোচিত হয়েছে এম.এন.শ্রীনিবাসের কথা। এই সূত্রে ভারতীয় বর্ণজাতিকাঠামোয় সামাজিক সচলতার ক্ষেত্রে ধর্ম ও অর্থের বহুমাত্রিক সমীকরণটি আমরা বোঝার চেষ্টা করেছি। অবশ্য, শ্রীনিবাস বা অন্যান্য সমাজতাত্ত্বিক বা নৃতাত্ত্বিকরা তাঁদের বিদ্যাশৃঙ্খলগত কারণেই একটা সীমাবদ্ধতায় ভোগেন। মূলত সাম্প্রতিক অতীত তাঁদের আলোচ্য হওয়ায় পরিবর্তনের ত্রিবিধ অভিমুখ—পরিবর্তনের কারণ, পরিবর্তনের অভিব্যক্তি, পরিবর্তনের তীব্রতাকে দীর্ঘমেয়াদি প্রেক্ষিতে তাঁরা দেখার সুযোগ পান না। ফলত, সামাজিক সচলতার ধারণার দিক থেকে সমাজতাত্ত্বিক বা নৃতাত্ত্বিকদের সঙ্গে সহমত হলেও পদ্ধতিগত ব্যাপারে আমরা তাঁদের থেকে একটু পৃথক। বিভিন্ন পাঠপদ্ধতির তুলনামূলক আলোচনার মাধ্যমে আমরা আমাদের প্রয়োজনীয় পাঠপদ্ধতি নির্মাণ করতে চেয়েছি।

২. বর্ণজাতিকাঠামোয় সামাজিক সচলতা: স্থান, কাল, পাত্র—

এই অধ্যায়ের দুটি উপবিভাগ —ভারতবর্ষীয় প্রবণতা ও বঙ্গদেশীয় প্রবণতা। ভারতবর্ষের মত বিপুলায়তন ভূখণ্ডের বর্ণজাতিব্যবস্থার ধারাবাহিক আলোচনা বর্তমান পরিসরে সম্ভব নয়। জাতপাতের আঞ্চলিক রূপভেদগুলিকে বিবেচনার মধ্যে আনলে তো ব্যাপারটা আরোই দুরূহ। উপরন্তু, ভারতবর্ষের

ক্ষেত্রে বর্ণজাতিব্যবস্থার উদ্ভবলগ্নকে যদিও বা চিহ্নিত করা যায়, ব্যবস্থাটির কোন পরিসমাপ্তিকাল চিহ্নিত করা অসম্ভব। নতুন নতুন গোষ্ঠী দীর্ঘদিন জাতের চেহারা নিয়েছে, সামাজিক সচলতার প্রক্রিয়াটিও চলছে নিয়মিতভাবেই। এদিক থেকে বর্ণজাতিব্যবস্থা পুরোদস্তুর জায়মান। আমরা তাই এই আলোচনায় ধারাবাহিক বিবরণের বদলে ভারতবর্ষে বর্ণজাতিব্যবস্থা ও সামাজিক সচলতার বিবর্তনের ধারা ও প্রবণতাগুলিকে দেখেছি। সাহিত্যিক সূত্র, পুরালেখ, স্মৃতিশাস্ত্র আমাদের আলোচনায় এসেছে। বঙ্গদেশের বর্ণজাতিব্যবস্থা ও সামাজিক সচলতা আমাদের মূল আলোচ্য। এক্ষেত্রে এই অধ্যায়ে আমরা প্রাক-চৈতন্যযুগ পর্যন্ত কালপর্বকে আলোচনার অন্তর্ভুক্ত করেছি।

৩. বঙ্গদেশের চৈতন্য অনুসারী বৈষ্ণব সম্প্রদায় ও বর্ণজাতিকাঠামোয় সামাজিক সচলতা: সুবর্ণবণিক

সুবর্ণবণিকদের মত আর্থিক প্রতিপত্তিশালী জাত খুব কমই আছে। অথচ, জাতের মর্যাদার নিরিখে তাঁদের অবস্থান নিচের দিকে। সুবর্ণবণিকদের ধর্মীয় অনুষ্ঠানে যাঁরা পৌরোহিত্য করেন তাঁরা ব্রাহ্মণ সমাজে পতিত। সুবর্ণবণিকদের আর্থিক প্রতিপত্তির সঙ্গে জাতিগত মর্যাদার সামঞ্জস্য তৈরি হয়নি। অথচ জাতিগত মর্যাদা ব্রাহ্মণ্য সমাজের নিরিখে অসম্ভব গুরুত্বপূর্ণ। সুবর্ণবণিক সমাজও এই বিষয়ে যথেষ্ট সচেতন ছিলেন। ষোড়শ শতকে সপ্তগ্রামের সুবর্ণবণিক সমাজ বৈষ্ণব গুরু নিত্যানন্দের কাছে দীক্ষা নেন। বৈষ্ণব সমাজে সাধনাধিকারও লাভ করেন। এই প্রক্রিয়ার সঙ্গে জড়িত ছিল সপ্তগ্রাম বন্দরও। সুবর্ণবণিকের সামাজিক সচলতা লাভের প্রয়াসকে বুঝতে গেলে সপ্তগ্রাম বন্দরের ইতিহাসকেও বুঝতে হয়। উনিশ শতকেও সুবর্ণবণিকের সামাজিক সচলতা লাভের প্রয়াস চলেছে। চারটি উপ-অধ্যায়ে বিষয়টি আলোচনা করা হয়েছে—ক) বঙ্গদেশীয় পুরাণ ও স্মৃতিগ্রন্থে সুবর্ণবণিক, খ) সপ্তগ্রাম বন্দর ও বাঙালি বণিক, গ) নিত্যানন্দের বৈষ্ণবধর্ম প্রচার ও সপ্তগ্রামী সুবর্ণবণিক সমাজ, ঘ) সুবর্ণবণিকের সামাজিক সচলতা ও বৈশ্যত্ব: পরবর্তী প্রকল্প

৪. বঙ্গদেশের চৈতন্য অনুসারী বৈষ্ণব সম্প্রদায় ও বর্ণজাতিকাঠামোয় সামাজিক সচলতা: মল্লরাজবংশ

অনেকেই বলে থাকেন, বিষ্ণুপুরের মল্লরাজারা বাগদি; 'নিচু' জাত। অথচ, ব্রাহ্মণ সভাপন্ডিতের বিবরণ ইত্যাদিতে তাঁরা ক্ষত্রিয় বলেই পরিচিত। সামাজিক সচলতার এই প্রক্রিয়াটি এই অধ্যায়ে খতিয়ে দেখা হয়েছে। সামাজিক সচলতার প্রয়াসে বৈষ্ণবধর্মের অবদান এক্ষেত্রে কতখানি সেই প্রশ্নটিও এপ্রসঙ্গে জরুরি। একটি সাধারণ গোষ্ঠীর সামাজিক সচলতার প্রচেষ্টার সঙ্গে একটি রাজবংশের সামাজিক সচলতার প্রচেষ্টার কি তফাত আছে? দুটি ক্ষেত্রে সামাজিক সচলতার অভিব্যক্তিগুলি কি আলাদা? মূলত এই প্রসঙ্গগুলিই বর্তমান অধ্যায়ে আমরা আলোচনা করেছি। আমাদের এই আলোচনা চারটি উপ-অধ্যায়ে বিভক্ত—ক) দক্ষিণ-পশ্চিম বাংলায় কৌম জনগোষ্ঠীর রাজ্যস্থাপন এবং মল্লরাজবংশ, খ) বর্ণজাতিকাঠামোয় মল্ল রাজবংশ: বাগদি উৎস বিষয়ক তর্ক, গ) শ্রীনিবাস আচার্য ও মল্লভূমে বৈষ্ণবধর্ম, ঘ) গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম ও মল্ল রাজবংশ: ক্ষত্রিয় মর্যাদার দাবি ও সাংস্কৃতিক নির্মিতি।

৫. বঙ্গদেশের চৈতন্য অনুসারী বৈষ্ণব সম্প্রদায় ও বর্ণজাতিকাঠামোয় সামাজিক সচলতা: সদ্‌গোপ

সদ্‌গোপরা পেশা বদলে কৃষিজীবী হয়েছেন। অবিভক্ত মেদিনীপুরে ব্রিটিশ পর্বেও সদ্‌গোপদের একাধিক জমিদারি ছিল। পয়সাকড়ি এবং জমিজমা থাকলেও রাজনৈতিক ক্ষমতা নিশ্চিত করার জন্য ধর্মকৃত্যগত মর্যাদাও জরুরি হয়ে পড়ে। গোপ পরিচয় ঝেড়ে ফেলে, পেশা বদলে সদ্‌গোপ হয়ে ওঠা গোষ্ঠীরও প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল ধর্মীয় স্বীকৃতি। বৈষ্ণবধর্মের সূত্র ধরে সদ্‌গোপরা রাজনৈতিক ক্ষমতার জন্য প্রয়োজনীয় ধর্মকৃত্যগত মর্যাদা ও সামাজিক সচলতা নিশ্চিত করতে চাইছিল। কৃষিজীবী, ভূ-সম্পত্তির অধিকারী সদ্‌গোপদের সামাজিক সচলতার প্রক্রিয়াটি এই অধ্যায়ে আমাদের আলোচ্য। পয়সাকড়ি আর জমিজমার সঙ্গে ধর্মীয় স্বীকৃতির সুবাদে রাজনৈতিক আধিপত্য কীভাবে পাকাপোক্ত হয়—সদ্‌গোপদের প্রসঙ্গে তা আলোচিত হয়েছে। এই অধ্যায়ে চারটি উপবিভাগ আছে—ক) মেদিনীপুরের জনবিন্যাস এবং শ্যামানন্দ-রসিকানন্দের ধর্মপ্রচার, খ) সদ্‌গোপদের বৈষ্ণবতার ইতিহাস, গ) গোপ, সদ্‌গোপ ও সদ্‌গোপদের নবশাখ মর্যাদাপ্রাপ্তি, ঘ) ঔপনিবেশিক শাসনব্যবস্থা ও সদ্‌গোপ সমাজ।

সিদ্ধান্ত-

প্রত্যেকটি গোষ্ঠীর সামাজিক সচলতার প্রক্রিয়া আলাদা আলাদা। প্রত্যেকটি গোষ্ঠীর অর্থনৈতিক সুযোগ-সম্ভাবনাও আলাদা রকমের। ফলত, সামাজিক সচলতার কোন সাধারণ নিয়ম হয় না। একারণেই, সামাজিক সচলতার আলোচনায় 'কেস স্টাডি' জরুরি। এই গবেষণাও সেই পদ্ধতি অনুসরণ করেছে। আমরা দেখতে পেলাম, ষোড়শ-অষ্টাদশ শতাব্দীর বঙ্গদেশে ইউরোপীয় বাণিজ্যশক্তিগুলি ঢুকতে শুরু করেছে। তার দরুণ তৈরি হওয়া নতুন আর্থিক সম্ভাবনাগুলিকে কাজে লাগিয়ে সুবর্ণবণিকরা নিজেদের অবস্থানকে আরও মজবুত করেছেন। বিষ্ণুপুরের মল্লরাজারা সীমান্তবর্তী বাংলায় ছিলেন মুঘলদের স্বাভাবিক মিত্র। এই অঞ্চলের মুঘল বিরোধী শক্তিগুলিকে জব্দ করতে মল্লরাজারা ছিলেন মুঘলদের প্রধান সহায়। সেই সূত্রে আদতে বাগদি মল্লরাজবংশের রাজনৈতিক ক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছিল। সদ্‌গোপরা ছিলেন মূলত কৃষিজীবী। মুঘল বাংলায় তাঁরা নতুন চাষযোগ্য জমি উদ্ধারের মাধ্যমে ভূম্যধিকারী হয়ে বসেন; বাণিজ্যেও তাঁদের অংশগ্রহণ ছিল। স্মার্ত বিধানে এই গোষ্ঠীগুলি প্রায় ব্রাত্য থাকায় বৈষ্ণবধর্মের সূত্রেই এঁরা সামাজিক সচলতার রাস্তা খুঁজে নেন। চৈতন্যদেব পরবর্তী সময়ে বঙ্গদেশের বৈষ্ণবধর্ম প্রান্তিক জাতিগুলির কাছে খুবই গ্রহণযোগ্য হয়ে ওঠে। ধর্মদর্শনগত কারণে স্মার্ত বিধানের তুলনায় ধর্মকৃত্যগত মর্যাদাদানের প্রশ্নে বঙ্গদেশের বৈষ্ণবধর্ম অপেক্ষাকৃত নমনীয়। সেকারণেই, জাতি নির্বিশেষে সাধনাধিকারকে প্রশস্ত করা সম্ভব হয়েছে। বঙ্গদেশের বৈষ্ণবরা অবশ্য স্মার্ত বিধানকে সম্পূর্ণ উড়িয়ে দেননি। জাতিকাঠামোর বিলোপনের বদলে সেকারণে জাতিকাঠামোয় অবস্থানগত রদবদল এবং সামাজিক সচলতা ঘটেছে বঙ্গদেশীয় বৈষ্ণবধর্মের হাত ধরে। বস্তুত, এই সচলতার সম্ভাবনাই জাতিকাঠামো বিলোপনের সম্ভাবনাকে অনেকখানি দুর্বল করে দিয়েছে। প্রান্তিক জাতিগুলিও অর্থনৈতিক পুঁজিকে সম্বল করে ধর্মকৃত্যগত মর্যাদা পেতে বৈষ্ণবধর্মের প্রতি দান-ধ্যানে কার্পণ্য রাখেনি। এইভাবে তৈরি হয় একটি মিথোজীবিতার সম্পর্ক। বৈষ্ণবধর্মের মত মার্গসংস্কৃতি সংশ্লিষ্ট, অভিজাত ধর্মের সূত্রে সামাজিক সচলতার সুযোগ তৈরি হওয়ায় মুঘল আমলে ইসলাম ধর্মগ্রহণের সংখ্যাও হ্রাস পায়। এই

সামাজিক সচলতা অনেকক্ষেত্রেই একটি বৈষ্ণব সমাজের মধ্যে বা বৈষ্ণবধর্মেরও নির্দিষ্ট পরম্পরায় সীমাবদ্ধ। নির্দিষ্ট পরিসরে এই সামাজিক সচলতা কার্যকর করতে বৈষ্ণবধর্মের প্রাতিষ্ঠানিক বিন্যাসটিও ছিল অসম্ভব গুরুত্বপূর্ণ। বর্তমান গবেষণা এই দিকগুলিতে বিশদে নজর দিয়ে মধ্যযুগের বঙ্গদেশের ধর্মজীবন ও অর্থনৈতিক জীবনের সম্পর্কটিকে বোঝার চেষ্টা করেছে।